# এক নজরে কলেজ

বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগর-সভ্যতার লীলাভূমি হযরত শাহ সুলতান বল্খির স্মৃতি বিজড়িত পূণ্যভূমি পুন্ড্রবর্ধনখ্যাত সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নগরী বগুড়া। উত্তর বঙ্গের কেন্দ্রস্থল বগুড়ায় কৃষি ও শিল্প বিকাশ ঘটেছিল সুপ্রাচীনকালেই। শিক্ষার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে ছিলনা অত্র অঞ্চল। প্রায় দেড় থেকে দুই হাজার বছর (খ্রীঃপূঃ ৬ষ্ঠ শতক থেকে ১২ শতক) পূর্বে পুন্ড্রবর্ধন তথা মহাস্থানগড়ে বিভিন্ন শাসক বর্গের কেন্দ্র ও প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিক্ষা দীক্ষায় এর চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। মধ্যযুগ পর্যন্ত এ ক্ষয়ষ্ণু ধারা অব্যাহত ছিল। চর্যাপদের বেশ কয়েক জন ভিক্ষু (পদকর্তা) সোমপুর (পাহাড়পুর) ও মহাস্থানের বিহারে (বেহুলার বাসর ঘর খ্যাত) শিক্ষা নিয়েছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন। সমগ্র মধ্যযুগে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো শিক্ষা ব্যবস্থাও টোল চতুষ্পাষী ও সত্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বৃটিশ আমলে ১৮২১ সালে বগুড়া জেলা গঠনের পর স্থানীয় জনগন এবং ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বগুড়ায় বেশ কিছু মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। এগুলোর মধ্যে বগুড়ার পৌড় উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৪৩), বগুড়া জেলা স্কুল (১৮৫৩) এবং সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল , ভি. এম স্কুল ১৮৫৭) অন্যতম। ১৯৩৯ সালের পূর্বে বগুড়ায় উচ্চ শিক্ষার জন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। তখন এ অঞ্চলের মানুষকে উচ্চ শিক্ষার জন্য নির্ভর করতে হতো- রাজশাহী কলেজ, পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ এবং রংপুর কারমাইকেল কলেজ উপর।১৯৩৮ সালে বগুড়ার কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী ব্যাক্তি অত্র অঞ্চলের মানুষের উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ উদ্দেশ্যে ১৯৩৮ সালের ৪ এপ্রিল বগুড়ায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষে খাঁন বাহাদুর মোহাম্মদ আলীকে সভাপতি এবং মৌলভী আব্দুস সাত্তারকে সাধারন সম্পাদক করে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সদস্যরা ছিলেন ডা. মফিজ উদ্দীন , ময়েন উদ্দীন পাইকার, ময়েন উদ্দীন প্রামাণিক, রফাতুল্লাহ, ডা. হাবিবুর রহমান, বাবু পূর্ন চন্দ্র রায়, নবীর উদ্দীন তালুকদার প্রমুখ। তবে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ২৪/০৬/১৯৩৮ তারিখের ৩৫০১ , ৩৫০২, ৩৫০৪, ৩৫০৬ এবং ২৭/০৬/১৯৩৮ তারিখের ৩৫৫০ নং দানকৃত জমির খাঁন বাহাদুর মোহাম্মদ আলীকে সভাপতি বগুড়া কলেজ উল্লেখ করে অর্গানাইজার ডাঃ মফিজ উদ্দীন, রফাতুল্লাহ, ডাঃ হাবিবুর রহমান এবং বাবু পূর্ণ চন্দ্র রায় এর নামে ফুলবাড়ি মৌজার জমির দানপত্র (অর্পণনামা) লিখে দেওয়া হয়েছে। তবে সবগুলো দলিলই যে অর্গানাইজারদের নামে করে দেওয়া হয়েছে এমন নয়। কোন কোনটি সভাপতির নামে কোনটি সাধারণ সম্পাদকের নামেও করে দেওয়া হয়েছে। ২৪/০৬/১৯৩৮ সালে যাঁদের দানকৃত জমির উপর কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধামন্ত্ম গৃহীত হয়, এঁরা হলেন-

| | দাতা | মৌজা | জমির পরিমান(একর) | জমির মূল্য (টাকায়) |
|---|---|---|---|---|
| ১ | ময়েন উদ্দীন পাইকার | ফুলবাড়ী | ০.০৬ | ২০/- |
| ২ | মিছু প্রামানিক | | ০.০৫ | ৩০/- |
| ৩ | মনির উদ্দীন (সোনার) | | ০.২৪ | ১০/- |
| ৪ | হাবিবুর রহমান ও হাফিজ উদ্দীন | | ০.৫১ | ৩৬/- |
| ২৭/০৬/১৯৩৮ | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৫ | মানিক উদ্দীন ও হানিফ উদ্দীন | | ০.১০ | ০৬/- |
| ৬ | রহিম উদ্দীন ও কলিম উদ্দীন | | ০.১১ | ০৬/- |
| | মোট= | | ১.০৭ একর | ৯৮/- টাকা |

উপরোক্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে প্রথম পুনরায় ৯ জন দাতার ১.০৭ একর জমির উপর কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধামন্ত হয়। ২৪/০৬/১৯৩৮ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য জমি পাওয়া গেলেও সম্ভবত এর কার্যক্রম মন্থর গতিতে চলছিল। দাতারা কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি শর্তে জমি দান করেছিলেন , দলিলে উল্লিখিত শর্তটি ছিল- দানকৃত জমিতে কলেজ প্রতিষ্ঠিত না হলে এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর অন্যত্র স্থানামন্তরিত হয় তাহলে জমির মালিকেরা বা এর বংশধরেরা জমি ফেরৎ পাবে বা কলেজ কতৃপক্ষ জমি ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকবে। এমন শর্তের কারনে কলেজ প্রতিষ্ঠার কর্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য ১৯৩৮ সালের ২২ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭.০০ টায় প্রজাবন্ধু রাজিব উদ্দীন তরফদারের সাতমাথাস্থ প্রজাসমিতি কার্যালয়ে স্থানীয় সূধীবর্গের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন- প্রজাবন্ধু রাজিব উদ্দীন তরফদার, মৌলভী ওসমান গণী, নবীর উদ্দীন তরফদার, বাবু নরেশ চন্দ্র, বাবু বজ্রনাথ দাস, মৌলভী ইয়াকুব আলী, মৌলভী ইয়াকুব হোসেন, জনাব আজিম উদ্দীন, মুন্সী জনাব আলী, ডা. ইজ্জত আলী, কবিরাজ আব্দুল আজিজ, জনাব দেসারাত উল্লাহ, ডাঃ কছির উদ্দীন আহমেদ, জনাব সায়েম উদ্দীন আহমেদ , মফিজ উদ্দীন আহমেদ এবং শাহ্ জসিম উদ্দীন প্রমুখ। বৈঠকে বিসন্তারিত আলোচনা শেষে বগুড়া কলেজ প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষে খাঁন বাহাদুর মোহাম্মদ আলী এম.এল.এ কে সভাপতি এবং মৌলভী মোঃ ওসমান গনী এম. এ (আলীগড়) কে সাধারন সম্পাদক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন সহ সভাপতি রাজীব উদ্দীন তরফদার এম.এল.এ , বাবু নলিনী চন্দ্র চক্রবর্তী এম. এ বি. এল, জমিদার পূর্ন চন্দ্র রায়, খাঁন বাহাদুর কোরবান আলী। সদস্য বৃন্দ হলেন মৌলভী দবির উদ্দীন আহমেদ, নবীর উদ্দীন তালুকদার এ্যাডভোকেট, বাবু নরেশ চন্দ্র বি. এল, ডা. কছির উদ্দীন তালুকদার এম. বি, ডা. মোজাম্ফর রহমান এম. বি , সৈয়দ দেলওয়ার আলী চৌধুরী বি. এল, আব্দুস সাত্তার তরফদার বি. এল, আব্দুল বারী বি. এল, বাবু প্রফুল্ল চন্দ্র সেন এম. এ. বি. এল, হিমাংশু রায় এম. এ. বি. এল, জনাব মোবারক আলী, জনাব হযরত আলী, জনাব মুজিবর রহমান, বাবু শিব চাঁদ আগর ওয়ালা, মৌলভী ছহির উদ্দীন আহমেদ , জনাব আব্দুল জববার খলিফা।

এই কমিটিকে নথিপত্রে সাময়িক ( Provisional) কমিটি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কমিটি ২৬ জানুয়ারী ১৯৩৯ নবাব বাড়ীতে (বর্তমান) সন্ধ্যা ৭ টায় জনাব মোহাম্মদ আলীর সভাপত্বিত্বে দ্বিতীয় দফা বৈঠকে বসে। বৈঠকে সিন্ধামন্ত, তদানিমন্তন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরির্দশকের অনুমতি পাওয়া গেলে অস্থায়ীভাবে সুবিল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (বর্তমান) ক্লাস শুরু হবে। অনুমতি পাওয়া না গেলে (তদানিমন্তন) নিশিন্দারা টেনারী ( Tannary) ভবনে কলেজের ক্লাস শুরু হবে। এই সিদ্ধামেন্তর অনুলিপি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর জনাব আজিজুল হক সাহেবের কাছে পাঠানো হয়। সৌভাগ্য, সুবিল স্কুলেই অস্থায়ী ভিত্তিতে কলেজের ক্লাস শুরুর অনুমতি পাওয়া যায়। ক্লাস শুরুর অনুমতি পাওয়ায় ৯ জুলাই ১৯৩৯ সালে কলেজের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। যদিও ২৪/০৬/১৯৩৯ তারিখে কলেজ পরিচালনা কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধামন্ত মোতাবেক কলেজের উদ্বোধনী সংক্রামন্ত যে, দাওয়াত কার্ডের নমুনা তৈরী করা হয় তাতে ২ জুলাই রবিবার ১৯৩৯ উল্লেখ ছিল। ঐ দিন উদ্বোধন হলেও কলেজের দাপ্তরিক অনুমোদন ( Official affiliation) পেয়েছিল ৯ জুলাই ১৯৩৯। একটি সূত্র থেকে জানা যায় , স্যার এম আজিজুল হক বগুড়ায় এসে সুবিল স্কুলে

কলেজের গভর্নিং বডির সাথে এক বৈঠক করেন। বৈঠকে কলেজের অনুমোদন সংক্রামন্ত দ্বি-পক্ষীয় আলোচনা হয় এবং তিনি অঙ্গীকার করেন যে, এই কলেজের সার্বিক উন্নতির লক্ষে ব্যক্তিগত উদ্যেগে যাবতীয় করবেন। এই বক্তব্য থেকেও ধারণা করা যায় উদ্বোধন করা হলেও কলেজ অনুমোদন হয়েছিল পরে। স্যার আযিযুল হক কলেজের সার্বিক উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেয়ায় এবং কলেজ অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় এক লক্ষ টাকা মওকুফ করায় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ কলেজের গভনিং বডি কলেজের নাম বগুড়া কলেজ এর পরিবর্তে বগুড়া আজিজুল হক কলেজ রাখার সিদ্ধামন্ত গ্রহণ করেন।
২৮শে জুন ১৯৩৯ পরিচালনা কমিটির সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি বাবু পূর্ন চন্দ্র রায়ের সভাপত্বিতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনা শেষে সিদ্ধামন্ত হয়, কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি খাঁন বাহাদুর মোহাম্মদ আলী সাহেবের নাম অনুসারে বগুড়া আজিজুল কলেজ রাখা হলো।

কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য শুরুতেই দানকৃত ১.০৭ একর জমি পাওয়া গেলেও সেখানে সঙ্গে সঙ্গেই অবকাঠামো নির্মান করা সম্ভব হয়নি আর্থিক সংকটের কারনে। সেকারনে যাত্রা শুরুর প্রায় দুই বছর পর্যমন্ত কলেজের ক্লাস সুবিল স্কুলেই নেয়া হয়। এসময় ফুলবাড়ীর পল্লীমঙ্গল সমিতি ছিল ছাত্রদের কমনরুম। ৯ই জুলাই ১৯৩৯ সালে কলেজের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হওয়ায় পরবর্তী কালে আরও কিছু দানকৃত জমি পাওয়া যায়। কলেজের জমির দলিলে উল্লিখিত এ পর্যায়ে দানকৃত ব্যক্তি ও জমির পরিমান হলো নিম্নরুপ-

| তারিখ | দাতা | জমির পরিমান (একর) |
|---|---|---|
| ১২/১২/১৯৩৯ | আয়েন উদ্দীন | ০.০৬ |
| ১২/১২/১৯৩৯ | মোজাম উদ্দীন পাইকার | ০.০৩ |
| ০৪/০৭/১৯৪১ | রমজান উদ্দীন পাইকার/ আব্দুর রহমান পাইকার | ০.২০ |
| ২১/১১/১৯৪৪ | আয়েন উদ্দীন ও তছলিম উদ্দীন | ০.৪০ |
| | মোট | ০.৬৯ |

উপর্যুক্ত (১.০৭+০.৬৯) ১.৭৬ একর দানকৃত জমি ছাড়াও পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে কলেজের জন্য প্রায় চার একর জমি ক্রয় করা হয়। ১৯৪২ থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যমন্ত সময়ের মধ্যে জমিগুলো ক্রয় করা হয়। কলেজের জমির পুরানো দলিলপত্রে দেখা যায় যাঁদের কাছ থেকে জমি ক্রয় করা হয়েছে তাদের অনেকেই ফুলবাড়ী এলাকার তাঁতী, জেলে প্রভৃতি নিম্ন শ্রেণীর মানুষ। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ক্রয় কৃত মোট ২০টি জমির দলিলের (১৯৪২-১৯৫৭) মাধ্যমে ১৪৩২/- টাকায় মোট ৩.৫৬ একর জমি ক্রয় করা হয়।
জমি ক্রয়, অবকাঠামো নির্মান, কলেজের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতাদির ব্যয় নির্বাহের জন্য কলেজের কোন স্থায়ী আর্থিক ব্যবস্থা ছিল না। এমতাবস্থায় স্থানীয় জনগনের সাহায্য সহযোগীতার উপরই নির্ভর করতে হয়েছে অমন্বত প্রাথমিক পর্যায়ে। কলেজের অর্থ সংগ্রহের জন্য ১৯৩৯ সালে হোয়াইট হয়ে নামক সার্কাস পার্টিকে অনুরোধ করে কলেজ ক্যাম্পাসে চ্যারিটি শো র আয়োজন করে ৩১৫৬ রুপি ৬ আনা আয় হয়। যার পুরোটাই কলেজের হিসাব তহবিলে (সেন্ট্রাল

ব্যাংক, হিসাব নং-৮৬, বগুড়া শাখা) জমা দেয়া হয়। এ হিসাব পরিচালনা করেন বাবু প্রফুল্ল চন্দ্র সেন। কলেজের ফান্ড বৃদ্ধির লক্ষে পি.ডব্লিউ.বি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে বগুড়া জেলার প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ থেকে একশত রুপি এবং সদস্যদের কাছ থেকে পাঁচ রুপি করে চাঁদা নির্ধারন করা হয়। কলেজের অর্থ সংগ্রহের আর একটি মাধ্যম ছিল স্থানীয় সিনেমা হল। হল কতৃপক্ষ কলেজের জন্য কিছু আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। কলেজের লাইব্রেরীর জন্য তাছানের জমিদার একহাজার রুপি দান করেছিলেন। সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে বার্ষিক সাড়ে তিন পারসেন্ট (৩.৫%) হারে আর দুই হাজার হাজার রুপি সংগৃহিত হয়েছিল। মূলত প্রাথমিক পর্যায়ে এভাবেই কলেজের আর্থিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ১৯৬০ সালে কলেজটি সরকারের সু-নজরে আসে। এসময় পাকিস্থান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী বগুড়ার সাতানী পরিবারের সমন্থান জনাব হাবিবুর রহমান বুলু মিয়ার প্রায় একক চেষ্টায় অত্র কলেজকে সরকারের শিক্ষা উন্নয়নের অধীনে ২০টি ডিগ্রী কলেজ উন্নয়ন প্রকল্পের অমন্থর্ভুক্ত করা হয়। এ লক্ষে কলেজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়। এর মধ্যে ১,৫২,২৪৬/- (এক লক্ষ বায়ান্ন হজার দুইশত ছয়চল্লিশ) টাকায় বগুড়া রেল ষ্টেশনের পশ্চিম পার্শ্বে কামারগাড়ী, নিশিন্দারা ও মালগ্রাম মৌজার প্রায় ৫৫ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। এ অধিকৃত জমিতে ১৯৬১-৬২ সালে প্রায় নয় লক্ষ টাকায় ইংরেজী ওঐহ অক্ষরের ন্যায় আধুনিক দ্বিতলা ভবন নির্মান করা হয়। ১৯৬১ সালের ৩১ অক্টোবর পূর্ব পাকিসন্থানের লেঃ জেঃ আজম খাঁন ভবনটির ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করেন। মন্ত্রী হাবিবুর রহমানের নামের অদ্যাক্ষর অনুযায়ী ইংরেজী ওঐহ অক্ষরের আদলে ভবনের স্থাপত্য নির্মিত হয়। ১৯৬২ ভবনের নির্মান কাজ শেষ হয়। ১৯৬৩-৬৪ সালে শিক্ষামন্ত্রী হাবিবুর রহমান কলেজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আরও তিন লক্ষ(৩ ,০০,০০০/-) টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন। এসময় কলেজ ক্যাম্পাসের ভেতর আভ্যমন্থরীন সড়ক , একটি দ্বিতলা ভবন, একটি একতলা ছাত্রাবাস (তিতুমীর হল) , একটি একতলা ছাত্রী নিবাস (রোকেয়া হল) , কলেজে বিদ্যুত ও পানির পাইপ সংযোগ, (নতুন ও পুরাতন উভয় ভবনে) ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন হয়। এছাড়া নতুন ও পুরাতন উভয় ভবনে সায়েন্স ল্যাবরেটরীর জন্য এক লক্ষ (১,০০,০০০/-) টাকা করে মোট দুই লক্ষ (২ ,০০,০০০/-) টাকা এবং কলেজ লাইব্রেরীর বই পুসন্থক ক্রয়ের জন্য আরও একলক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়।

১৯৬৮ সালের ১৫ এপ্রিল কলেজটি সরকারীকরন করা হয়। ১৯৬৮ সালে কলেজটি সরকারিকরন করা হলেও এর অধ্যক্ষ পদটি ১৯৬২ সালের ২৪ নভেম্বর হতে সরকারী ডেপুটেশন পদের অমন্থর্ভুক্ত হয়। অধ্যক্ষ সরকারী কোন উর্ধঃতন কমকর্তাকে অধ্যক্ষ রুপে নিয়োগ দেয়া হয়। এসময় (১৯৬২) থেকে কলেজের শিক্ষকরাও জাতীয় বেতন স্কেলের অমন্থর্ভুক্ত হন। ১৯৬২ সালে শিক্ষদের বেতন স্কেল ২২৫-৪২৫/- টাকা, ১৯৬৩ সালে ২৫০-৫০০/- টাকা এবং ১৯৬৪ সালে ৩৫০-৭০০/- টাকা (সর্বসাকুল্যে) নির্ধারিত হয়।

১৯৬৮ সালের ১৫ এপ্রিল কলেজটি সরকারিকরনের পূর্ব পর্যমন্থ একটি গভর্নিং বডির তত্বাবধানে পরিচালিত হতো। সরকারিকরনের পূর্ব পর্যমন্থ বিভিন্ন সময়ে যাঁরা এ পরিচালনা পরিষদের সভাপতির পদে দ্বায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা হলেন খাঁন বাহাদুর মোহাম্মদ আলী এম. এল (১৯৩৯-৪৭), খাঁন বাহাদুর খোন্দকার আলী তৈয়ব ডি. এম (১৯৪৭-৪৮) ,জনাব সৈয়দ মর্তুজা আলী ডি. এম (১৯৪৮-৪৯),জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ডি. এম (১৯৪৯-৫০), জনাব আমিন উলস্নাহ ডি. এম (১৯৫০-৫১) , জনাব এম. মাসুদ ডি. এম (১৯৫১-৫৩), জনাব আব্দুল আজিজ ডি. এম

(১৯৫৩-৫৪), জনাব এম. এ. হাসান (১৯৫৪-৫৫), জনাব জি. আহমেদ (১৯৫৫-৫৬) , জনাব নাজির আহমেদ (১৯৫৬-৫৮), জনাব এস. এ মজুমদার ডি. এম (১৯৫৮-৫৯) , জনাব এ. এম. এফ রহমান ডি. এম (১৯৫৯-৬০), জনাব এস. এ রাজা ডি. সি (১৯৬০-৬১), জনাব কে. এম শমসুর রহমান ডি. সি (১৯৬১-৬২), জনাব মাফতুন আহমেদ ডি. সি (১৯৬২-৬৩), জনাব এস. এম. ওবায়দুলস্লাহ ডি. সি (১৯৬৩-৬৫), জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান ডি. সি (১৯৬৫-৬৮)।

কমিটিতে সাধারন সম্পাদকের দ্বায়িত্ব পালন করেন মৌলভী মোঃ ওসমান গনী এম. এ (১৯৩৯-৪৮), মৌলভী মোঃ আব্দুস সাত্তার তরফদার (১৯৪৮-৫৩) , জনাব বাবু বি. এল শিরোমনী (অধ্যক্ষ)(১৯৫৩-৫৮), জনাব ওহায়েদ বখশ (অধ্যক্ষ)(১৯৫৮-৬১) , জনাব মোঃ এখলাশ্ (অধ্যক্ষ)(১৯৬১-৬২), জনাব মোঃ ইসহাক (অধ্যক্ষ)(১৯৬২-৬৬)একটি সূত্রমতে জনাব মাহবুবুর রহমান চৌধুরী এর পরে সাধরণ সম্পাদকের দ্বায়িত্ব পালন করেন। কমিটিতে প্রথম কোষাধক্ষের দ্বায়িত্ব পালন করেন বাবু প্রফুল্ল চন্দ্র সেন।

কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ড. এম.এম. মুখার্জি (আগষ্ট ১৯৩৯- সেপ্টেম্বর ১৯৩৯) এবং প্রথম উপাধ্যক্ষ ছিলেন শ্রী এস.পি সেন। কলেজ সরকারীকরনের পূর্ব পর্যমন্ত যারা অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা হলেন - , ডঃ এম, এম মুখার্জি, ডঃ কে,পি মুখার্জী, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী, জনাব কাজেম উদ্দিন আহমেদ, জনাব এ,জি, হক, জনাব বি,এল শিরোমনি, জনাব এম, ওয়াহেদ বক্শ, জনাব মুহম্মদ এখলাস, জনাব মুহম্মদ ইসহাক (সরকার প্রতিনিধি) , জনাব সৈয়দ হেশাম উদ্দিন । কলেজ সরকারীকরনের পর যাঁরা অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা হলেন -, ডঃ হাফেজ আহমেদ, ডঃ খান মোঃ সিরাজুল ইসলাম, জনাব আনোয়ার আলী খন্দকার, জনাব মোঃ খোদা বক্শ মিয়া, জনাব মোঃ আবুল হোসেন, ডঃ মোঃ মোসলেম উদ্দিন, জনাব মোঃ যোবদুল হক, প্রফেসর আব্দুস সাত্তার, প্রফেসর এস এম গোলাম রববানী, প্রফেসর আব্দুস সাত্তার, প্রফেসর খলিলুর রহমান, প্রফেসর সেলিমা ডেইজী, প্রফেসর মোঃ আনছার রহমান খন্দকার , প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম, প্রফেসর আহসানুল হক চৌধুরী, প্রফেসর ডঃ মোঃ আশেরাফুল ইসলাম, প্রফেসর ডঃ মোঃ মছির উদ্দিন, প্রফেসর মোঃ আব্দুল গফুর(চলতি দায়িত্বে), প্রফেসর ড. মোঃ সুলতান আলী , প্রফেসর শিরিনা এনাম(চলতি দায়িত্বে) এবং বর্তমানে অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন প্রফেসর এ.কে.এম. ছালামত উল্লাহ । কলেজের বর্তমান উপাধ্যক্ষ প্রফেসর শিরিনা এনাম।

কলেজের যাত্রার শুরুতে কেবলমাত্র আই-এ শ্রেণী চালুর অনুমতি পায়। শুরুতে প্রায় ২০০ জন শিক্ষার্থী ছিল কোন ছাত্রী ছিল না। প্রথম ব্যাচের ছাত্রদের মধ্যে যাদের নাম পাওয়া তারা হলেন মোজাম পাইকার, আমীর আলী, শফিকুর রহমান, আব্দুল মালেক নূরুল ইসলাম ভোলা প্রমুখ। ১৯৪১ সালে কলেজের প্রথম ব্যাচের পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় ১৫২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১০৭ জন পরীক্ষায় পাশ করে। এর মধ্যে প্রথম বিভাগে ০৮ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৬৪ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ৩৫ জন পাশ করে। পাশের হার ছিল ৬৯.২%। অথচ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই হার ছিল ৬৩.৪%।

প্রতিষ্ঠালগ্নে আই.এ. শ্রেণীতে বংলা (সাধারণ) , বাংলা (২য় ভাষা) , ইংরেজী (আবশ্যিক), ইংরেজী (অতিরিক্ত), ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি , যুক্তিবিদ্যা, পৌরনীতি, সাধারণ গণিত, আরবী/ ফার্সী বিষয়গুলো পড়ানোর অনুমতি পেয়েছিল।

সেসময় যারা কলেজের শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁরা হলেন ইংরেজী- শ্রী কে. সি. চক্রবর্ত্তী, সংস্কৃত ও বংলা- শ্রী প্রভাত চন্দ্র সেন এম.এ.বি.টি, আরবী ও ফার্সী- মোঃ আব্দুল গফুর , গণিত- শ্রী মনিন্দ্র চন্দ্র চাকী এম.এ, ইতিহাস- শ্রী এস.পি সেন বি.এ (সম্মান) লন্ডন , যুক্তিবিদ্যা- মোঃ ফজলুর রহমান এম.এ , পৌরনীতি- মোঃ আকবর কবির এম.এ।

প্রতিষ্ঠাকালে কলেজে ছাত্রী ছিলনা, এটা সত্য হলেও ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে কোন নিষেধাজ্ঞা ছিলনা। জানা যায় ১৯৪৩ সাল থেকে কলেজে ছাত্রী ভর্তি শুরু হয় এবং এই সংখ্যা ছিল ৮ থেকে ১২ জন। পরবর্তীতে এই সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পায়। এরপর ১৯৫৩ সাল পর্যমন্ত ছাত্রীরা সকালের শিফ্টে বর্তমান ভি.এম গার্লস স্কুলে ক্লাশ করত। ঐ বৎসরই কলেজে সহ শিক্ষা চালু হলে এই প্রতিবন্ধকতার অবসান ঘটে, উজ্জীবিত হয় শিক্ষার মহৎ ও মানবিক উদ্দেশ্য , এতদিন যা সম্প্রদায়িকতার রোষানলে পরে পদদলিত হচ্ছিল।

প্রতিষ্ঠার মাত্র ২ বছর পর, অর্থাৎ ১৯৪১ সালে কলেজে, অর্থনীতি এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে দুবছর মেয়াদী সম্মান শ্রেণী ও বি.এ পাস কোর্স চালুর অনুমতি লাভ করে। ড. কে. এম ইয়াকুব আলীর মতে, তদানীমন্তন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এটিই প্রথম কলেজ যেখানে সেসময় সম্মান শ্রেণী চালুর অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু শিক্ষক স্বল্পতা ও অন্যান্য অসুবিধার কারনে কলেজ পরিচালনা কমিটি শুধুমাত্র ইসলামের ইতিহাস বিভাগে সম্মান এবং বি.এ পাস কোর্স চালু করেন। এরপর ১৯৪৫-৪৬ শিক্ষাবর্ষ হতে কলেজটি বংলা এবং আরবী বিভাগে সম্মান ও আই.কম শ্রেণী চালুর অনুমতি লাভ করে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর নবগঠিত পাকিস্থান রাষ্ট্রে কলেজটি আইনতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হয়ে পরে। প্রশাসনিক জটিলতার অজুহাতে সেসময় কলেজে সম্মান শ্রেণী পরিত্যাক্ত হয়, এবং আই.এস.সি. শ্রেণী (পদার্থ, রসায়ন, অংক) চালুর অনুমতি পায়। আই.এস.সি. শ্রেণীতে বায়োলজি বিষয় অমন্তর্ভূক্ত হয় ১৯৪৮-৪৯ শিক্ষাবর্ষে। এর কিছুকাল পরে ১৯৫৪-৫৫ শিক্ষাবর্ষে কলেজটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ হয় এবং আরবী, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে তিন বছর মেয়াদী সম্মান শ্রেণী চালু করা হয় । সরকাররিকরনের পর কলেজে বাংলা, অর্থনীতি, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে সম্মান পড়ানোর পাশাপাশি বি.এ,বি.কম, বি.এস.সি, আই.এ, আই.কম, আই.এস.সি চালু হয়।

১৯৭২-৭৩ সালে সম্মান কোর্সে বাংলা , ইহিতাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি , অর্থনীতি, আরবি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত ও হিসাববিজ্ঞান চালু হয়। মাস্টার্স কোর্স অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান চালু করা হয়। ১৯৭৩-৭৪ সালে মাস্টার্স ও সম্মানে যথাক্রমে ৩১৭ ও ৬১৮ সহ মোট ৩ ,৭৮৭ জন ছাত্রছাত্রী ছিল। শিক্ষক ছিলেন ৯০ জন।

বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ২৩টি বিষয়ে অনার্স এবং ১৮টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্সের পাশাপাশি ডিগ্রী পাস কোর্সে বি.এ, বি.এস.সি , বি.এসএস, বি.কম কোর্স চালু রয়েছে। এছাড়া রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বিজ্ঞান , ব্যবসায় শিক্ষা এবং মানবিক বিষয়ে এইচ.এস.সি কোর্স চালু রয়েছে। এছাড়া উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কোর্স চালু রয়েছে। কলেজে একটি আইসিটি ইন্সটিটিউট রয়েছে যেখানে বিজ্ঞান ও আইসিটি মন্ত্রণালয়ের অধীন আইসিটি বিষয়ের উপর ১ বছর মেয়াদী পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স, বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটির অধীন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড এ্যাপ্লিকেশন্স বিষয়ে এক বছরের ডিপ্লোমা কোর্স এবং বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ছয় মাস মেয়াদী বিভিন্ন বিষয়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের কম্পিউটার লাবের মাধ্যমে স্বল্প মেয়াদী কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু

রয়েছে। এছাড়া একটি আমর্ন্তজাতিক ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে যেখানে ইংরেজি , আরবীসহ বিভিন্ন ভাষার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

কলেজে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৩২ হাজার শিক্ষকদের জন্য সৃষ্ট পদ ১৯৬ টি । বর্তমানে কলেজের পুরাতন ও নতুন দুটি ভবনই চালু আছে। কলেজের মূল (পুরাতন) ভবনে এইচ.এস.সি পাঠ চলে এবং নতুন ভবনে স্নাতক , স্নাতক(সম্মান) ও মাস্টার্স পড়ানো হয়। কলেজের পুরাতন ভবনে ৯টি শ্রেণী কক্ষ , ৪টি গবেষণাগার , ১টি গ্রন্থাগার , অফিস, ছাত্র-ছাত্রী বিশ্রামাগার, বি,এন,সি,সি ভবন, দ্বিতল মসজিদসহ ৫টি ভবন।

নতুন ভবনে ১টি ত্রিতল ভবন , ১টি ৪তলা বিজ্ঞান ভবন , এবং ১টি দ্বিতল গ্রন্থাগার রয়েছে। ১টি দ্বিতল অধ্যক্ষ ভবন, ১টি ছাত্র সংসদ ভবন, ১টি দ্বিতল মসজিদ, ১টি রোভার্স স্কাউট ভবন এবং ১টি খেলার মাঠ রয়েছে। শ্রেনীকক্ষ- ৭১, লাইবেরীকক্ষ -৭ , গবেষনাগার-১৮

কলেজের নতুন ভবনে ছাত্রদের জন্য ৩টি হল যথাক্রমে তিতুমীর হল, শের-ই-বাংলা হল, শহীদ আকতার আলীমুন হল এবং ছাত্রীদের জন্য রোকেয়া হল নামে ১টি আবাসিক হল রয়েছে। এছাড়া পুরাতন ভবনে ছাত্রদের জন্য ফখরুদ্দিন আহমদ হল নামে একটি হল রয়েছে।

লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা প্রায় ২২ ,০০০ হাজার। কলেজে ১৯৬৮ সালে প্রায় ২ ,৫০০ আসন বিশিষ্ঠ একটি বৃহৎ অডিটোরিয়ম নির্মাণ করা হয়।
কলেজে বি.এন.সি.সি , রোভার স্কাউট , রেডক্রিসেন্ট, বাধন এর কার্যক্রম প্রশংসনীয়।
কলেজে ২টি সাংস্কৃতিক সংগঠন রয়েছে একটি কলেজ থিয়েটার অন্যটি নীলতলী। জাতীয় ও ধমীয় দিবসগুলি যথাযথ মর্যদা ও ভাবগম্ভীর্যের সাথে উদ্যাপন করা হয়ে থাকে।
কলেজের দুই ভবনের সামনে ২টি বৃহৎ খেলার মাঠ রয়েছে যেখানে ক্রিকেট , ফুটবল এবং ভলিবল খেলা হয়ে থাকে। ক্রীড়াঙ্গনে এই কলেজের সুনাম রয়েছে।
ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবহণের জন্য ২টি বড় বাস , ২টি মিনিবাস, এবং অফিসের কাজে ব্যবহারের জন্য ১টি মাইক্রোবাস রয়েছে।

এই কলেজের পরীক্ষার ফলাফল অত্যমন্ত সমেন্তাসজনক। এইচ.এস.সিতে বোর্ডের মেধা তালিকায় প্রতিবছরই এই কলেজের অবস্থান রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাক্রমে প্রথম , দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানসহ প্রতিটি বিষয়ে এই কলেজের অবস্থান রয়েছে।

মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সরকারি বৃত্তি ছাড়াও কলেজ হতে মেধাবী ও গরীব ছাত্রদেরকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। শতকরা হারে অবৈতনিক/অর্ধবৈতনিক সুবিধা দেওয়া হয়। হাবিবুর রহমান মেমোরিয়াল স্কলারশিপ ফান্ড এবং রইস উদ্দিন খাতেমুন্নেছা বৃত্তি নামক দুটি বৃত্তির ব্যবস্থা আছে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটেলিয়ান ১৩ এর প্রধান ক্যাম্প স্থাপন করে এবং পরবর্তীতে চলে যাওয়ার সময় কলেজের প্রচুর তথ্য, যন্ত্রপাতি ও আসবাব পত্র ধ্বংস করে। তারা মোঃ মমতাজুর রহমান নামে একজন কর্মচারীকে গুলি করে হত্যা করে। কলেজ প্রাঙ্গনে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ এগিয়ে যাক বহুদুর। এই বিদ্যাপীঠের আলোয় উদ্ভাসিত হোক আগামী প্রজন্ম ; সে আলো ছড়িয়ে যাক্ প্রিয় মাতৃভূমি সোনার বাংলাদেশের সব ক্ষেত্রে আজ এই সময়ে এমন প্রত্যাশা সবার।